Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501085 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The multidimensional tone of 'unhappiness' in 21st-century Bengali poetry: In the light of some recent poems

একুশ শতকের বাংলা কবিতায় বহুমাত্রিক 'অ-সুখ'এর স্বর: সাম্প্রতিককালের কয়েকটি পঠিত কবিতার আলোকে

Dr. Shrutiparna Roy
Assistant Professor
Bengali Department
Rani Indira Devi Government Girls' College, Jhargram

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 09th May 2026

Abstract:
We have crossed two and a half decades of the twenty-first century. Over these past twenty-five years, through the ebb and flow and overwhelming tides of social, political, economic, and cultural transformations across the globe, the riverbed of time has accumulated new layers of impact and experience. If, tracing the marks of this continual making and unmaking of the world, we arrive at the contemporary reality of this country—and more specifically, of this state — we shall see how these twenty-five years of the twenty-first century have dimmed the familiar smiles on the faces of people around us, both known and unknown. Our "statements" on every matter are increasing, yet our mutual "conversations" are gradually running dry. Living on this ancient planet, we have become far more complex. Outwardly, almost all the instruments of happiness have now become easily accessible to us. And yet, our inner selves seem afflicted by some nameless malady. Even after struggling through the battles of a lifetime and reaching the summit of fulfilled desires, we still seem unable to truly consider ourselves happy. Where, then, lies the seed of this "unhappiness"? If one listens closely to the air, certain words are often heard on the streets of the city: "Society has completely decayed"; "The system itself is rotten from within"; or "We are living in a sick society." But whether it is society or the system, both are ultimately the outcome of the voluntary collective existence of active and thinking individuals. Therefore, in searching for the seeds of "unhappiness" within society or the system, we inevitably arrive at the individual human being — more precisely, at ourselves. The poetry of the past two and a half decades of the twenty-first century bears within it this restless attempt to search within oneself for the source of this "unhappiness." This self-consuming and agonizing endeavour has made poets vulnerable, fearful, and despondent; yet at the same

© Santiniketan Sahityapath

time, it has intensified and deepened their longing for humanity and love, making it all the more poignant and appealing.

Through an examination of a selection of poems by several contemporary poets written over the last twenty-five years of the twenty-first century, we shall attempt to perceive the multidimensional wounds and the true nature of this "unhappiness" in our times. At the same time, we shall seek the poets' personal paths toward nirvana amidst these various afflictions — paths that may perhaps inspire the "unhappy" people of our age either to struggle against the delusions and distortions of time or to surrender to them, and through that very process of being wounded, to recognize the ultimate roots of the malady and search for windows of healing. Although the debate continues in the arena of poetry as to whether poetry should bear any responsibility for curing "unhappiness," today's small yet devoted community of poetry readers—worn down by the many ailments of time, society, and system — may still expect from their worshipped goddess of poetry, if not some miraculous benediction, at least a few traces of healing wisdom.

In selecting the poems for this study, we have tried to choose only those written between 2000 and 2025. In this regard, the earliest comes from Shankha Ghosh's poetry collection Joloi Pashan Hoye Ache (written between 2001-03, published in 2004). Chronologically, the latest selected poems date up to 2022. Following the sequence of time, our discussion includes thematic poems by poets such as Ranajit Dash, Rahul Purakayastha, Chaitali Chattopadhyay, Hindol Bhattacharya, Yashodhara Raychaudhuri, Sudeshna Maitra, and Sutapa Chakraborty, among others. The essay will explore the many dimensions of the maladies of our times: loneliness, sorrow, depression, memory and forgetting, the desire for self-destruction, the aggression of the virtual world, and excessive dependence on commodities.

Key Words:
Illness, time, wound, memory, oblivion, market, advertisement, exhaustion, healing, living

মূল প্রবন্ধ

মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তার পর আবার সসত্ত্বা হবেন।... তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।"[১] আমরা, যারা একটি শতাব্দীর অবসানলগ্ন পেরিয়ে নতুন একটি শতাব্দীর জন্মের সাক্ষী থেকেছি, তাদের কাছে একুশ শতকের অতিক্রান্ত পঁচিশটি বছর অনেক প্রাপ্তি, প্রতীক্ষা, স্বপ্ন, নৈরাশ্য, সংযুক্তি, বিচ্ছেদ আর সুখ, যন্ত্রণার অভিঘাত ও উপলব্ধি গচ্ছিত রেখে গেছে। ব্যক্তিক স্তরে এই সমস্ত উপলব্ধিই কমবেশি প্রতিটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করলেও একুশ শতকের বিশ্বায়িত যাপন আমাদের শিখিয়েছে, কোনো কিছুই আজ আর ব্যক্তিগত নয় পুরোপুরি; ঠিক যেমন কোনো বিষয়ই নয় পুরোপুরি অন্য বা অপর। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের কোনো একটি ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থকলেও তা যে আমাদের সামূহিক জীবন এমনকি ব্যক্তিগত যাপনের ভিতকেও নাড়িয়ে দিতে পারে — যুদ্ধ আর অতিমারি-উত্তর পৃথিবীতে আজ তা আর আমাদের অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। তাই হয়তো আমরা এখন অনেক বেশি ত্রস্ত, সাবধানী কিংবা পরিণামচিন্তাহীন বেপরোয়া। ভার্চুয়াল নলেজের এই যুগে প্রতিনিয়ত অজস্র ঘটনার আপডেট নিতে নিতে আমাদের ভিতরে রোজ যে ক্লান্তি জমে, সেই ক্লান্তিরই ক্রমবিলম্বিত বহিঃপ্রকাশ হলো এক অসুখী যাপন। সে যাপনকে ঘিরে রসদের ভিড় যত বাড়ে, তার সজীব স্পন্দন তত কমে আসে। বস্তুর ভিড়ে ক্রমশ মানুষ চাপা পড়ে যায়, ঘটনা গিলে খায় মুহূর্তকে, আর আমাদের ব্যক্তিগত জিরো আওয়ারগুলিও বিক্রয়যোগ্য অথবা

© Santiniketan Sahityapath

বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। এই বিকিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, হাঁপিয়ে ওঠা, অ-সুখী সময়ের কথাই বলে একুশ শতকের বাংলা কবিতা। 'অ-সুখ'এর সেই স্বর বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয়। কবির এককের বয়ানে মিশে যায় অজস্র ব্যক্তিস্বরের নির্যাস। একুশ শতকের বাংলা কবিতা যেন হয়ে ওঠে অসুখের দিনলিপি আর নিরাময়ের সূত্রসন্ধানের নথি। একুশ শতকের প্রথিতযশা কয়েকজন বাঙালি কবির নির্বাচিত কিছু বাংলা কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা একুশ শতকের কবিতার এই বহুমাত্রিক 'অ-সুখ'এর স্বরসমূহকে চিনে নেব এবং কবিতার পথ ধরেই খুঁজে নিতে প্রয়াসী হব এই 'অ-সুখ'এর প্রতিষেধক। আমাদের আলোচিত কবিরা হলেন — শঙ্খ ঘোষ, রণজিৎ দাশ, রাহুল পুরকায়স্থ, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, হিন্দোল ভট্টাচার্য, যশোধরা রায়চৌধুরী, সুদেষ্ণা মৈত্র এবং সুতপা চক্রবর্তী। একুশ শতকের প্রেক্ষিত ও প্রবণতাকে যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য উল্লিখিত কবিদের সেই সমস্ত কবিতাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে যেগুলির রচনাকাল একুশ শতকের অন্তর্গত। তবে কবিতার বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে এই কবিদের কবিতার কয়েকটি প্রবণতার উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা সমসময়ের অভিঘাতেরই ফসল —

প্রথমত, Cultural Memory একালের কবিতা-স্বরের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। গাঢ়তর স্মৃতির পরিসর বিশ শতকের বাংলা কবিতাতেও ছিল যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ঔপনিবেশিকতার গ্লানি আর যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতিজাত নিভৃত বিষাদ। জীবনানন্দ দাশের কলমে আমরা এই স্মৃতিভারাক্রান্ত কবিতার অনন্য আস্বাদ পেয়েছি। তবে একুশ শতকের কবিদের কলমে যে স্মৃতি ধরা দিয়েছে, তাতে কালো দমচাপা বিষাদের শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণার পরিবর্তে রয়েছে হালকা বিষণ্ণতার পাতলা কুয়াশার আস্তরণ। যেহেতু এই কবিরা দুই শতকের সন্ধিক্ষণকে দেখেছেন, আর অনুভব করেছেন ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠা কনজিউমারাইজেশনের বৈশ্বিক চিত্রটিকে, তাই তাঁদের কাছে বিশ শতকের শেষ দু'তিনটে দশকের নিপাট সাদামাটা যাপন সুখস্মৃতি হয়ে ধরা দিয়েছে; যে যাপনে মুহূর্তেরও ছিল কিছু ব্যক্তিগত মূল্য আর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত বৃহত্তর বাজার অর্থনীতির দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ছিল না। এক্ষেত্রে কবিদের Individual Memory এসময়ের জাতকদের Collective Memoryকে প্রতিফলিত করেছে প্রায়শই। তবে স্মৃতি এক্ষেত্রে সতত সুখের নয়। তাই এই সময়ের কবিদের কবিতার স্মৃতিপথ ধরে আমরা বিশ শতকের নানা সামাজিক-রাজনৈতিক অবনমন ও স্খলনকেও পুনরাবিষ্কার করি যাকে অনেকাংশে Trauma Memory বলা যায়। তবে স্মৃতির পাশাপাশি এই সময়ের কবিতায় ধরা দিয়েছে বিস্মৃতির অসুখও। একুশ শতকের মানুষ কেমন দ্রুতগতিতে নিজেদের ইতিহাসের সমস্ত স্বপ্ন, সংগ্রামকে ভুলে গিয়ে ঝকঝকে পণ্যসর্বস্ব তথাকথিত সুখী জীবনের খোলসে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য স্মৃতি-সহ পুরনো সমস্ত কিছুকেই ধুয়ে মুঝে ফেলে নির্ঝঞ্ঝাট হওয়ার অভিযানে নেমেছে — সে প্রসঙ্গও এসেছে এসময়ের একাধিক কবিতায়। এই সামূহিক বিস্মৃতিকে একপ্রকার বিস্মৃতির অসুখই বলা চলে।

দ্বিতীয়ত, একুশ শতক কমোডিটির যুগ। মানুষের প্রাত্যহিকের খুঁটিনাটি সমস্ত প্রয়োজনের জন্য পণ্যের জোগান এখন অফুরন্ত। ডিজিটাল মার্কেটিং-এর এই যুগে মানুষের কাছে সেই পণ্য পৌঁছেও যাচ্ছে অতি সহজে। সবস্তরের মানুষের কাছে এই সব পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজারে প্রতিযোগিতার শেষ নেই। পণ্যের এই সহজলভ্যতা এবং বিজ্ঞাপনের নিত্যনতুন রঙিন হাতছানি এসময়ের মানুষকে একই সঙ্গে সুখী এবং অসুখী করে তুলছে। পণ্যের ব্যবহারে যে সুখ ও আরাম আছে, বিজ্ঞাপনের কৌশলে তা শতগুণ হয়ে ধরা দিচ্ছে আমাদের কাছে। বিজ্ঞাপনসর্বস্ব বর্তমান সময়ে তাই পণ্য হয়ে উঠেছে মানুষের সুখ ও অ-সুখের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক।

তৃতীয়ত, একুশ শতকে প্রায় অধিকাংশ মানুষ দুই পৃথিবীর বাসিন্দা — একটি বাস্তব পৃথিবী, অন্যটি ভার্চুয়াল পৃথিবী, যেখানে বেশিরভাগ সত্যই নির্মিত। এই নির্মিত সত্যের জগতে আমরা নিজেদের এক কল্পিত ইমেজ গড়ে তুলতে নিত্য কসরত করে চলেছি। ভার্চুয়ালে নির্মিত সত্যের সামান্য বিচ্যুতিও আজ হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী অসুখের কারণ। অন্যদিকে ভার্চুয়াল জগতের বিমূর্ত মুখোশটিকে আশ্রয় করে তথাকথিত সভ্যতার আড়ালে চলে কুকথা ও হেনস্থার যে বিকৃত অনুশীলন — তা যে আদপে সামাজিক অসুস্থতারই লক্ষণ, সে দিকটিও উঠে এসেছে একুশ শতকের বাংলা কবিতায়।

চতুর্থত, এই শতাব্দীর মানুষের কাছে বিচ্ছেদ এক অনিরাময়যোগ্য অসুখ হয়ে ধরা দিয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্কের চরম ভঙ্গুরতা আমাদের প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। অন্যদিকে পৃথিবীব্যাপী ব্যাধি, দুর্যোগ ও যুদ্ধের পরিণতিতে অজস্র মানুষের

মৃত্যুর খবর আমাদের জীবন সম্পর্কে নির্লিপ্ত কিংবা বেপরোয়া করে তুলছে। আমরা ব্যক্তিগত মুহূর্তের সুখকে আঁকড়ে বাঁচতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ছি একাকিত্ব ও অবসাদের অন্ধকারে। কেউ কেউ আবার আত্মহননের পিচ্ছিল পথ ধরে খুঁজতে চাইছে পরিত্রাণের উপায়। এই একাকিত্বজনিত অবসাদের অসুখ আর আত্মহননের টেনশন নিহিত রয়েছে একুশ শতকের প্রায় অধিকাংশ কবির কবিতায়। এই সমস্ত লক্ষণগুলিকে সামনে রেখেই আমরা একুশ শতকের কিছু বাংলা কবিতার পর্যালোচনায় যাব।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সময় ও সমাজের যাবতীয় ব্যাধি, বিকার ও বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চকিত বয়ানকে ছাপিয়ে অন্তর্নিহিত ভাবলোকের মগ্নতায় মিশে থাকে। তাঁর ‘জলই পাষাণ হয়ে আছে’ (রচনাকাল ২০০১-২০০৩), ‘সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি’ (রচনাকাল ২০০৪-২০০৬) প্রভৃতি শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা সময়ের ক্ষয়িষ্ণুতার এমনি মগ্ন উপস্থাপনে সোচ্চার। “আমরা ততটা দেখে খুশি থাকি যতটুকু দেখে এ সময়/ তার বেশি নয়।”[২] হিসেবি এই সময়ে ভালোবাসাও গণিতের সূত্রে মেলে যা শেখায় ‘অবিশ্বাস ছাড়া কিছু নেই’। অবিশ্বাসের এই অসুখ আমাদের মাঝখানে বসে সকলকে অনায়াসে গ্রাস করতে থাকে। আমরা বুকে তাই অনুভব করি পাথরজমা ভার। সেই ভার বহন করতে করতে আমরা অসুখী জীবন কাটাই। অবশেষে একদিন গড়িয়ে পড়ি জীবনের শিখর থেকে মৃত্যুর অন্ধকারে। আমাদের যাপিত জীবন আমাদের কোনো পূর্ণতায় উপনীত করে না, কারণ আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ছোটো ছোটো সফলতায় অন্ধ আর নিজের ভিতরেই রুদ্ধ। আমাদের মৃত্যু তাই ব্যক্তিগত নয়, সামূহিক। এই মৃত্যু শুধু শরীরেরও নয়, অন্তর্নিহিত সত্তার। সেই মৃত্যুর শোকে স্তব্ধ কবি লেখেন — “এবার/ আসুন, এক শতাব্দী আমরা নীরব হয়ে দাঁড়াই।”[৩] এই সারি সারি সেলাই করা জড়বৎ মৃত মানুষের ভিড়ে সংযোগসূত্র শুধু বাজার। নিজেকে এই বৃহত্তর বাজারে টিকিয়ে রাখবার তাগিদে অথবা এই বাজারটাকে সচল রাখবার তাগিদে আমরা পরস্পর আবদ্ধ হই। আমাদের সেই দায়বদ্ধ সংযুক্তির ভিতরে তাই সেঁধিয়ে থাকে হিমশীতল নিস্পৃহতা। পারস্পরিক জীবনের সংস্পর্শ আমাদের কোনো সজীবতায় উদ্ভাসিত করে না, “মনে হয় যেন বেঁচে আছি শুধু বেঁচে থাকবার দোষে।”[৪] বাজারসর্বস্ব যাপনের এই অ-সুখকে কবি উপস্থাপিত করেন কিছুটা বিজ্ঞাপনের মতোই চড়া দাগের শব্দ ও ছন্দের মাধ্যমে —

“বাইরে এলে চোখ পুড়ে যায়, এদিকওদিক জুড়ে
বিশ্বলোকের চর্‌কি ঘোরায় যাকিছু জমকালো
যেদিকে চাই সমস্তটাই উৎসবে-ঝংকারে
রূপের উপর রূপ ঢেলে দেয়, আলোর উপর আলো।”[৫]

বুকের উপর ভালোবাসার বৃক্ষ নয়, বরং আদ্যোপান্ত সাজিয়ে তোলা নির্জীব এক বাজারকে বয়ে চলতে চলতে আমরা প্রস্তরীভূত এক জড়বৎ জীবন কাটাই।

রণজিৎ দাশের ‘সমুদ্র সংলাপ’ (রচনাকাল ২০০৪-২০০৬) থেকে ‘বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা’ (রচনাকাল ২০১৬-২০১৭) পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতায় ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি প্রধান প্রবণতা হলো — চেতনার অন্তর্নিহিত বিষাদ, ডিপ্রেশন বা অবসাদের অসুখ, ভোগমুখর যাপনের অসুখ এবং সর্বোপরি ভার্চুয়াল আগ্রাসনের অসুখ। তিনি নিজেকে বলেন ‘বেদনার ধুন-পরীক্ষক’, কারণ তিনি শরীরের ভিতর বিষণ্ণতার মাপকাঠি নিয়ে ঘোরেন, “এই জীবনে কখনও কখনও, সুস্থতাই রোগ, পাগলামিই তার চিকিৎসা।”[৬] তাই বেদনাই তাঁর কাছে বোধ, অথবা বোধই বেদনা। ‘তাস-জুয়াড়ির মতো মানুষের গম্ভীর মুখ’ যে নাগরিক বিষাদকে ঢেকে রাখে, তিনি তারই উদ্‌যাপন করেন। তাঁর মনে হয় — “যখন বিষণ্ণ থাকি/ বুঝি, আমি সুস্থ আছি, স্বাভাবিক আছি।”[৭] আমরা কেউ নিখুঁত নই, একমাত্র আমাদের ভুলগুলিই মারাত্মক নিখুঁত — জন্ম থেকেই পঙ্গু, বেঢপ, ধূর্ত, জালিয়াত, দিশেহারা এইসব নাগরিক মানুষের ভুলজীবনের যাপনচিত্রকে নির্মোহ চোখে দেখেন তিনি। সেই ছবিতে পার্ক স্ট্রিটের আকাশে সপ্রতিভ চাঁদ উঠলে চৌরঙ্গীপাড়ার দুঃখকেও সুখ বলে মনে হয়, আর স্বপ্নের ভিতর একটা ‘ব্যাপক হারামি’ ছেঁড়াখোঁড়া লোককে দেখে তাঁর মনে হয় — ‘এই লোকটাই কি আসল আমি?’ অস্তিত্বের এই সপ্রশ্ন শূন্যতার মাঝখানে ডিপ্রেশনই তাঁর অসুখ আবার আশ্রয়ও। তাই মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো স্পেলে

© Santiniketan Sahityapath

মনে ডিপ্রেশনের ঢেউ উঠলে তিনি যত্নে জিইয়ে রাখেন তাকে। মনের নিম্নচাপ আর শোকদুঃখকে কিছুটা সাফ করে নেন ডিপ্রেশনের ঝড়ে। তাঁর মনে হয় — "ফুর্তির চেয়ে অশ্লীল এবং বেদনার চেয়ে পবিত্র এই জগতে আর কিছু নেই।"[৮] তবে যে অসুখ তাঁকে চেতনার গভীরে গিয়ে ভাবায় এবং উদ্বিগ্ন করে, তা হলো মানুষের জীবনে ভার্চুয়াল আগ্রাসনের অসুখ। ভিডিও গেমে আসক্ত এক 'ডিজিটাল-নেশাড়ু শয়তান' যে ক্লাউনটাকে দিবারাত্র ক্লান্তিহীন গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে মোবাইলের স্ক্রিনে, তার সেই দুর্বার ভার্চুয়াল গতি যেন টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের নামে নির্মনন ছন্দে জড়চেতনার দিকে ছুটে চলা এই নাগরিক ব্যবস্থারই রূপক হয়ে ওঠে। চারিদিকে মোবাইলে নিবদ্ধ হেঁট মাথা, কানে গোঁজা হেডফোন, আর লোকের মুখে কাঁপতে থাকা লাল নীল আলোর মারণ ইশারা দেখে তাঁর মনে হয়, এরা কেউ মানুষ নয়, বরং রোবট অথবা এলিয়েন। তারা সবাই ভার্চুয়ালে নিমজ্জিত। কেউ পৃথিবীর দিকে মুখ তুলছে না, মানুষের দিকে মুখ তুলছে না। ভার্চুয়ালের অসুখে আক্রান্ত এই একুশ শতকের মানুষেরা 'রৌদ্রে, মেঘে, শস্যে, প্রেমে নির্বিকার, ভ্রুক্ষেপহীন'। ডিজিটাল সম্মোহনে এভাবেই ক্রমশ বন্ধ্যা হয়ে আসা মানবজমিনের ভয়াল ছবি এঁকেছেন তিনি কবিতায়।

রাহুল পুরকায়স্থর কবিতাশরীরের প্রতি ভাঁজে জমে থাকে সমসময়ের ক্ষতচিহ্ন। তাঁর চেতনায় 'প্রতি মৃত্যু জন্ম নেয়' আর 'প্রতি জন্ম মরে'। সময়ের মাটিতে জমে থাকা রক্তাপ্রলেপ তাঁর কলমে ঢেলে দেয় 'রহস্যচতুর মায়া, সৌরক্ষত, বিষ'। আর এই বিষেরই প্রেরণায় কবিতার পথ ধরে তিনি শূন্যের দিকে হেঁটে চলেন। একালের জয় কাব্যের প্রতিটি মৃত্যুর কাছে তিনি যেন ডানাভাঙা অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি অনুভব করেন 'মেধার ময়ূর' আর অক্ষরবিভূতি তাঁকে বোধিস্বর্গে উন্নীত করার পরিবর্তে ক্রমশ নামিয়ে আনছে রক্তরসমিশ্রিত এক অসুখী সময়ের পুন্নামে বা রৌরবে। সময়সংকেত তাঁকে নামিয়ে আনে এক মিডিয়াশহরে, যেখানে কবি ও ঘাতক সমার্থক। 'এ পৃথিবী রণলালা' আর সময়ের শরিক হিসাবে তিনিও সেই 'লালার সন্তান'। তাই অনিবার্যভাবেই অন্ধকার দেশকালের ক্ষতগুঞ্জরণ তাঁর কবিতার পংক্তি নির্মাণ করে। সময়ের ক্ষত উপচে রক্তের ঝাপট এসে আছড়ে পড়ে তাঁর শরীরে, মাথায়; আর তাঁর কবিতার গায়ে এসে লাগে তারই ছোপ। তখন সময় ও শূন্যতার রাক্ষুসে ডালা খুলে ভয়াল সমস্ত পংক্তি তিনি লিখে রাখেন খাতায় —

"মা-রক্ত, দেখেছ, দেখো শিশুরক্তে আহার জোগায়,
দু-ঠোঁটে অন্নের আভা, ভালবাসা এমনই রক্তিম,
আমাকে চেনো না তুমি, গুপ্তঘাতকের দেশে ফেরি করি যাদুবিদ্যা,
খলের ভূষণ, আর গৃহযুদ্ধে ব্যবহৃত কঙ্কালের জামা,
গগনে দুলছে চন্দ্র, অর্ধভুক্ত, কীসের উপমা!"[৯]

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের 'অসুখের কবিতারা' (প্রকাশ ২০২১) পৃথিবীব্যাপী অতিমারির আবহে রচিত কবিতার সংকলন হলেও, অসুখের ব্যঞ্জনা এখানে বহুমাত্রিক যা শুধুমাত্র একটি বিশেষ সময়ের সংকট পেরিয়ে বহতা সময়ের নানাবিধ পীড়াকে কবিতায় অবয়ব দেয়, "চারপাশে রক্ত দেখছি শুধু।/ টিভিতে। খবরের কাগজে, পথে, পাড়াপ্রতিবেশীর চোখেমুখে।"[১০] অতিমারির ভয়াল দিনগুলি পেরিয়ে আজকের রক্তস্নাত রাজনীতি আর দেশে দেশে ঘনিয়ে ওঠা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও এই পংক্তিসত্যের ঘ্রাণ একই রকম টাটকা বলে অনুভূত হয়। চারপাশে রক্তের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কবির মতো আমরাও কী অনুভব করি না চোখের কোণে সেই মেঘের অস্তিত্ব। যা আমাদের কিছুতেই সুখে থাকতে দেয় না! আমাদেরও প্রাত্যহিক যাপনে সান্নিধ্যেরা মরে যেতে থাকে আর দেয়াল ক্রমশ শারীরিক হয়ে ওঠে। তখন এমন সমস্ত কবিতা পংক্তিগুলিকে বড়ো জীবন্ত বলে মনে হয় —

"এখন আনন্দের গায়ে মরামাস লেগে রয়েছে।
শ্যাম্পু করলে যাচ্ছে না।
এখন দুঃখের গায়েও দুঃখ, ফুঁ দিলে উড়ছে না!"[১১]

© Santiniketan Sahityapath

চৈতালীর কবিতা ভীষণ স্পষ্টভাবে ছুঁয়ে থাকে স্বভূমির গায়ে লেগে থাকা টাটকা ক্ষতদাগগুলিকে। কৃষিবিল থেকে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের হাওয়াই চপ্পল পেরিয়ে আরো সংলগ্ন সময়ের দিকে তার বিস্তার। প্রতি মুহূর্তের মৃত খবরের আপডেট রাখতে গিয়ে তিনি দেখেন —

"টেরই পাইনি এতদিন, কি আশ্চর্য,
আমরা কখন মরে গেছি!"[১২]

নিজেকে তাঁর মনে হয় অ্যানিমিক পৃথিবীটায় কোলকুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে প্রলাপ বকতে-থাকা পাগল। তবু এক অসুখী সময়ে দাঁড়িয়ে এই প্রলাপই তাঁর শক্তি যাকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে বলা যায় — "মনে রেখো, ঠাণ্ডা ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু আগুনের ব্যবস্থা আনতে গিয়ে/ একদিন পুড়ে গেছিলাম।"[১৩]

হিন্দোল ভট্টাচার্যের কবিতা যেন ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকে বিশ্বায়নের সময়কাল পর্যন্ত এক দীর্ঘ যাত্রাপথের স্মৃতিজাত চেতনার ফসল। তাঁর ভাবজগতে 'একবিংশে অষ্টাদশ দিন' খেলা করতে থাকে। এদেশের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের উত্তরাধিকার তাঁকে পুরুষানুক্রমিক এক ক্ষতের ভাগীদার করেছে। সেই ক্ষতচিহ্নের স্মৃতি বুকে নিয়ে তিনি লেখেন — "সীমানা তাঁবুর মতো উপনিবেশের/ ক্ষতচিহ্ন লেখে শুধু, ঘন ঘন কেঁপে ওঠে শহরজীবন/ এই একবিংশকালে,"[১৪] তবে একুশ শতকের ভোগসর্বস্ব পণ্যসভ্যতা আমাদের শরীরে মুহূর্তের সুখের সঙ্গে বিস্মৃতির অসুখেরও বীজ রেখে যায়। এই আত্মবিস্মৃতির অসুখের শরিক কমবেশি আমরা সবাই। কবি অনুভব করেন — 'এ অসুখ আসলে রাজার।' তাই একুশ শতকের বিশ্বায়নের শরিক এই স্বাধীন দেশের শাসনযন্ত্রেরও শিরায় মিশে থাকে উপনিবেশেরই স্বভাব। একবিংশ থেকে পিছিয়ে যেতে যেতে বর্গি, হুন, শক-এর কয়েক হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের ধারাতেও তিনি আবিষ্কার করেন একই রক্তদাগ, বিষ। তাঁর চেতনায় তাই 'মুহূর্ত অনন্ত আঁকে', একেই নিহিত থাকে অনেক, আর যুগের অসুখকে বুঝতে গিয়ে তিনি বোঝেন — 'ভবিষ্যৎ-বর্তমান এক!' কারণ ইতিহাসের প্রায় সবকটি বাঁকেই আমরা বিস্মৃতির অসুখে আক্রান্ত হয়েছি। একুশ শতকের অবক্ষয় তাই আমাদের পূর্ব ইতিহাসের অবক্ষয়েরই অনুবর্তন। একালের মানুষের চেতনাকেও তাই গ্রাস করেছে বিস্মৃতির জ্বর —

"কোনও নিশান নেই কোনও উঠোন নেই কোনও লোককথা
আর কোথাও মনে রাখছে না মানুষ"[১৫]

আমাদের শরীরে মিশে আছে 'তেষট্টি বছরের চাপা অন্ধকার'। এই অসুখ ও অন্ধকারেরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সমাজে —

"ভালোবাসা আর রাজনীতির ভিতর ফারাক রাখছে না ড্রয়িংরুম
কাগজের ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ছে সদ্যমৃত যৌবন
সরু খালের মতো দুর্গন্ধ আমাদের স্বপ্ন
সরু হয়ে আসছে, কালো হয়ে আসছে, শুকনো হয়ে আসছে হাসি
আমরা ভালোবাসার কথা বলছি আর হিংসার গন্ধ বেরচ্ছে আমাদের নিশ্বাস থেকে"[১৬]

এই তীব্র হিংসা আর অপ্রেমের কেন্দ্রে আছে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতা। আমরা কেউই সেই প্রতিযোগিতার বৃত্তের বাইরে নই। আমরা আর সবকিছু ভুলে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার তাগিদে ছুটে চলেছি। নিজের সুখের ঝুলি ভরার ব্যস্ততায় অন্যের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না, "কিছু হারিয়েছে কেউ, অন্ধকারে অসহায়/ তাই তুমি পেয়ে গেছ কিছু!"[১৭] — মানুষের মধ্যে এই ব্যবসায়িক লেনদেনের সংযোগটুকুই অবশিষ্ট আছে এই একুশ শতকে। ছেড়ে আসা স্মৃতিগলির ভিতর উঁকি দিয়ে তাই কবি কোনো অবলম্বন খুঁজে পান না, শুধু দেখেন — "এদিকে ওদিকে ছিটকে চলে গেছে/ নব্বই দশক!" বিশ্বায়িত এই বাজার যেন একটা বিশাল বুলডোজার। যার সামনে লিলিপুটের মতো আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি; আর মৃত্যুর কাছে বেঁচে থাকার শপথ নিতে নিতে দরজায় আঁচড় কেটে চলেছি রোজ রাতে। আবার প্রতিদিনই খোঁচা খাওয়া বৃদ্ধ বাঘের মতো 'পেটের ধান্দায়' আত্মহননেও

রাজি হয়ে যাচ্ছি আর নিজেদের কেটে কেটে অন্যের বুকপকেটে পুরে দিচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই তাই এক একটা নিজস্ব 'আউসউইএজ' তৈরি হয়েছে, আর 'লম্বা চিমনির ভিতর থেকে উঠে আসছে মানুষের আত্মার ধোঁয়া'। হিন্দোল ভট্টাচার্যের কবিতায় সময়ের অসুখে মৃত এই সমস্ত আত্মার পোড়া গন্ধ মিশে থাকে।

যশোধরা রায়চৌধুরীর ২০২২এ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'পীড়াসমূহ' ক্ষয়ে যাওয়া সময়ের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যমাখা দিনলিপি। তবে এই ক্লান্তিজনিত অবক্ষয়ের ভিতর শুধু স্তব্ধতা নয়, বরং চাপা একটা রাগ মিশে থাকে। সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেই দমচাপা রাগেরই বহিঃপ্রকাশ। তাই কোথাও 'জনতা জনার্দন দনাদ্দন পেটাচ্ছে' কাউকে, একদল কিশোর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কিশোরীর ধর্ষণের ভিডিও দেখছে কোথাও, কোথাও আবার বেনোজলে ভাসতে থাকা মানুষ নিজেরই দেশে নাগরিকত্বের প্রমাণ খুঁজে চলেছে। আসলে এক 'পীড়াভুবনে' আছি আমরা। সেখানে 'প্রতি পদে বস্তুরাজির সঙ্গে ঠোক্কর প্রাপ্ত হতে হতে চলার নামই বিলাসিতা।' ভার্চুয়াল জগতে প্রতিদিন নিজেদের নতুন নতুন চিত্ররূপ রচনা করে আমরা যাপনের একঘেয়েমি দূর করি — "সুতরাং নব চাকচিক্য, নতুন পোশাক ও নানা নব মুদ্রা সহকারে আমাদের উৎফুল্লবদনে হাজিরা দিতে হয় এই অসামাজিকতার আগারে। যার নাম সামাজিক মাধ্যম।"[১৮] 'নব নব বিষ ও বিষাদ'এর তিক্ততা আর নেশায় আক্রান্ত মানুষ 'প্রত্যেকে আছে নিজের ভেতরে গোঁজা।' প্রত্যেকে শুঁড়িপথ খুঁজে ফাঁকা পথ পেতে চাইছে। তবু ভার্চুয়ালের কারাগারে বন্দি একুশ শতকের বিশ্বায়িত পৃথিবীর মানুষকে দেখলে মনে হয় —

"একটাই ছোট ঘরে
খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে
একদল খুব অসুখী মানুষ বন্দিশালার কেন্দ্রে
আটকে রয়েছে... ।"[১৯]

অতিমারি যেন সময়ের অবক্ষয়ের রূপক হয়ে ধরা দেয় তাঁর চেতনায়। তাই — "মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর। পীড়া শেষ হয়ে গেলে নতুন পীড়ার নান্দীরোল।"[২০] সময়ের অবক্ষয়জনিত পীড়ার এই অনিবার্য আবর্তন মনে করায় আলব্যের ক্যামু-র 'দ্যা প্লেগ' উপন্যাসের ডাঃ রিও-র শেষ উপলব্ধিকে — "এই উল্লাস সব সময়েই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় পঙ্গু, কারণ এই উল্লসিত জনতা যে সত্য জানে না তিনি নিজে তা জানেন ।... তিনি জানেন যে যুগ যুগ ধরে এ-বীজ সুপ্ত অবস্থায় আসবাব আর বিছানাপত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, জানেন যে তারা অসীম ধৈর্য নিয়ে মানুষের ঘরে, নিচের চোরকুঠুরিতে, তোরঙ্গের মধ্যে, রুমালে, আর বইয়ের আলমারির তাকে তাকে অপেক্ষা করে,"[২১] সময়ের অসুখকে শরীরে-মনে ধারণ করে চলতে চলতে আমাদের নেশা ও বিষের মতো সমস্তই অভ্যাস হয়ে আসে, শুধু ভালোবাসার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়।

২০২১এ প্রকাশিত সুদেষ্ণা মৈত্রের 'একরোখা চিরুনি তল্লাশি' কাব্যগ্রন্থটি ২০২৫ সালে সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। এই কাব্যে রয়েছে পণ্যায়িত জীবনের বিষাদ ও ক্লান্তি, মৃত্যুভয়, ভালোবাসা হারানোর হাহাকার আর নিরাময়ের মরিয়া খোঁজ। 'জন্মেই পাখিস্তব্ধ' কবি পিঠে বয়ে বেড়ান 'বেড়ালের হাই'এর মতো অপরিসীম ক্লান্তি। নিজেকে তিনি সাজাতে চান শীতঋতুর রিক্ততায়। পণ্যায়িত জীবনজুড়ে পুঁজির দাপট তাঁকে আহত, ক্লিষ্ট করে। তিনি লেখেন —

"হয়তো নাচিয়ে তোলে পুঁজি
উঠে আসে বুক জুড়ে ভাড়া
আহত গাছের মতো থাকি
চিৎকারে বড্ড পাহারা"[২২]

এই আত্মবিস্মৃত ভোগবিলাসের হট্টগোলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাঁর। নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেন — "কীভাবে এতক্ষণ আত্মাশূন্য আছি?" বিজ্ঞপ্তির এই যুগে টিকে থাকতে গেলে আত্মবিজ্ঞাপন অবশ্যম্ভাবী জেনেও যাপনের ছলাকলায় ক্লান্ত হয়ে তিক্ত স্বরে যেন নিজেরই দিকে প্রশ্ন ছোঁড়েন তিনি — "একটু ছলচাতুরী না করলে এই যে কলটা দাঁড়িয়ে আছে এখনও ঠায় জামাহীন, / চামড়াহীন নির্লজ্জের

© Santiniketan Sahityapath

মতো আকাশের দিকে চেয়ে — পারত?"[২৩] তবু বাইরের ঝলমলে মুখোশের ভিতরে লুকিয়ে থাকে এক বিপন্ন মুখ, পৃথিবীব্যাপী হিংসা আর রক্তপাত যার জীবনবোধকে আহত করে প্রতিদিন। তাই যে কোনো মৃত্যুর পরে মুখোশ খুলে দেখে নিতে হয় — "আয়না চিনতে পারে না কি!" যথেচ্ছ 'মৃতদংশন'এ আমরা স্মৃতিভ্রংশ হই, "মরুষড়যন্ত্রে তৃষ্ণার্তের কাঠ-কান্না শুধুই পাথরজন্ম দেয়..." বিশ্ববাজারের পায়ের তলায় আমরা প্রভুর কুকুরের মতো হাড় খুঁজে বেড়াই।

২০২২এ প্রকাশিত সুতপা চক্রবর্তীর 'দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম' কাব্যগ্রন্থটিও ২০২৪এ সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। সমস্ত কাব্যগ্রন্থ জুড়ে ফেলে আসা শিকড়লগ্ন জীবনের নানা লোকায়ত অনুষঙ্গ আমাদের স্মৃতিমগ্ন করে তোলে। সত্যনারায়ণ সেবা, উঠোনে গোবর লেপা, আটার সিন্নি, জলচৌকি, জোকার দেওয়া, সাবিত্রী ব্রত, সজনেডাঁটা চিবোনো, মাষকলাই, বরইর টক, মঙ্গালচণ্ডীর পাঁচালি — এই সমস্ত স্মৃতি অনেক দূরে ফেলে এসে যে সময়ে ঢুকে পড়েছি আমরা, 'সেটা না-ফেরার দেশ'। আমরা সবাই এখন 'একটা শূন্যের উপরে বসে আছি।'একটু একটু করে প্রতিদিন তলিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে একটা হেস্তনেস্ত করতে গিয়ে তিনি দেখেন গোটা বাড়িটা যেন মহামারির মতো ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে। জনশূন্য ঘরের অন্ধকার খাঁচায় 'নিজেই নিজের শরীরে পা পিছলে পড়ে' যান তিনি, প্রতিদিন শুধু শরীর মাপতে থাকেন। আত্মহননের অ-সুখী স্বর মিশে যায় তাঁর কবিতার বয়ানে —

"অনেকদিন হলো মারা গেছি। আমার লাশের তলায় এখনও জ্বলজ্বল
করছে দুটো সাপ।"[২৪]

নিজেকে কেটেকুটে দেখতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন 'ভেতরের ঘরে মরা পোড়া লাশ', আর 'বাইরে অফুরন্ত সুখ।' সময়ের সংক্রমণজাত এই অসুখের অনিবার্যতা অনুভব করে তিনি লেখেন — "যত বড় চিকিৎসকই হোক, আমার এই অসুখ সর্বনাশী।"[২৫]

একুশ শতকের বাংলা কবিতায় 'অ-সুখ'এর বহুমাত্রিক বয়ানের সমান্তরালে রয়েছে মগ্নতা, প্রশান্তি ও আরোগ্যের খোঁজ এবং কবিদের নিজস্ব একটি প্রস্থানে উপনীত হওয়ার প্রয়াস। শঙ্খ ঘোষের শেষপর্বের কবিতা তাই সময়ের প্রদাহকে স্বীকার করেও 'আরো বেঁধে বেঁধে' থাকার বীজমন্ত্র দিয়ে যায় আমাদের। রণজিৎ দাশের কবিতায় আবার সময়ের 'অ-সুখ'জাত অবসাদই হয়ে ওঠে চেতনার আশ্রয়, কারণ 'জীবনের আসল নায়ক হচ্ছে বিষণ্ণ মানুষেরা', যেমন — ব্যাসদেব, হোমার, যুধিষ্ঠির, মৈত্রেয়ী, গৌতম বুদ্ধ কিংবা যিশু খৃস্ট। যে মহৎ মানুষেরা মানবসভ্যতার অবক্ষয় থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন, তাঁরা আসলে যুগের সঞ্চিত অবসাদেরই ফসল। কবি তাই বেদনাকে ভয় পান না, বরং এই বেদনাই তাঁর কাছে বিশ্ববোধ হয়ে ধরা দেয়। রাহুল পুরকায়স্থ সময়ের ক্ষতের মধ্য দিয়ে শূন্যের দিকে ছুটে যেতে যেতে কবিতা আর প্রেমের কাছেই আশ্রয় খুঁজে পান। 'শরীরে চাঁদের ক্ষত' নিয়েও তাই তিনি প্রতি প্রেমে 'ঈশ্বরপ্রতিম' জীবনের গান শুনতে পান। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অসুখের পাশাপাশি বেঁচে থাকে সেরে ওঠার আশ্বাস। তাঁর কবিতার পংক্তি অনুসরণে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে হয় — "মন্ত্রের মতো, মনকে শুনিয়ে যাব শুনিয়েই যাব: সেরে ওঠো,/ সেরে ওঠো..."[২৬] হিন্দোল ভট্টাচার্যের কাছে কবিতাই সমস্ত অসুখের নিরাময় হয়ে ধরা দেয়। তিনি লেখেন — "যখন কবিতা লিখি, সমস্ত অসুখ সেরে যায়।"[২৭] সময়ের দমচাপা অসুখের ভিতরে শ্বাস নিতে কষ্ট হলেও তিনি ছুঁয়ে থাকেন ভালোবাকেই, 'যতক্ষণ না ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ;' যে-কোনো ঘুমন্ত মুখ দেখলেই তাঁর ভালোবাসা জাগে, 'প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়,' আশ্রয়ের খোঁজ করতে করতে তিনি পৌঁছে যান আদিসভ্যতার কাছে, আর উপলব্ধি করেন — 'হিংসার ভিতরে আছে আমাদের অহিংসার গান'। যশোধরা রায়চৌধুরীর কবিতায় ওষুধের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকে সুস্থতার স্বপ্ন। তিনি লেখেন — "আমাদের বিমল কর প্রেমগুলো বার বার হবে তাই, জ্বরপরবর্তী।"[২৮] সুদেষ্ণা মৈত্র মৃত্যুস্রোতের ভিতর দিয়েও চেনা তরী নিয়ে পারাপার করে চলেন জীবন ও ভালোবাসার দিকে। সিঁড়িহীন সন্ত্রাসকে কোনো আকাশ তিনি দিতে রাজি নন। তাই পকেটে 'মনকেমন' জমিয়ে রেখেও তিনি বলেন — "আমার তো চুম্বনই অসুখ সারাত... "[২৯] বিশ্বের একাকী নদীপথে নেমে গিয়ে যে বালক আর কখনো ফিরে আসেনি, তার উদ্দেশে উৎসমুখ থেকে ভেসে আসে মায়ের ডাক — "হলো হলো। খেতে যাবে চলো।"[৩০] সুতপা চক্রবর্তীর কবিতায় স্মৃতিই উপশমের পথ দেখায়। সেই স্মৃতিপথে পুকুরপাড়ের ঝোপে একজোড়া টুনটুনি তাদের সন্তানদের আগলে রাখে, আর "প্রায় রোজই একটি বালক আসে... ফুল

পাড়ে এবং একটি অদৃশ্য/ নৌকা নিয়ে ততোধিক অদৃশ্য হয়ে যায়।”[৩১] একুশ শতকের বাঙালি কবিদের কবিতায় ‘অ-সুখ’ এমনি বহুরৈখিক চিন্তার অবকাশ রেখে যায় যাকে আশ্রয় করে সময়ের ক্ষত ও প্রতিষেধের প্রায় কেন্দ্রস্থলটিকে আবিষ্কার করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১। ‘গামানুষ জাতির কথা’, পরশুরাম গল্পসমগ্র, রাজশেখর বসু, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯২, পৃ. ২৮৪

২। ‘জলই পাষাণ হয়ে আছে’, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৬, পৃ. ১৮২

৩। ‘সে অনেক শতাব্দীর কাজ’, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৬, পৃ. ১৮৪

৪। ‘আরো কয়েক পা’, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৬, পৃ. ১৯০

৫। ‘বাজার’, শ্রেষ্ঠ কবিতা, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০১৬, পৃ. ২০১

৬। ‘কবিতার জিরো আওয়ার’, রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, রণজিৎ দাশ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২০, পৃ. ১৩৯

৭। ‘যখন বিষণ্ণ থাকি’, রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, রণজিৎ দাশ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২০, পৃ. ১৩৫

৮। ‘ডিপ্রেশন’, রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, রণজিৎ দাশ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২০, পৃ. ১০৪

৯। ‘সময় ও শূন্যতা’-৩, নির্বাচিত কবিতা, রাহুল পুরকায়স্থ, কবিতা আশ্রম, চাঁপাবেড়িয়া বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, জানুআরি ২০২২, পৃ. ১১

১০। ‘সাইনাস’, অসুখের কবিতারা, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৭

১১। ‘অশৌচ’, অসুখের কবিতারা, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১২

১২। ‘প্যান্ডেমিক’, অসুখের কবিতারা, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১৬

১৩। ‘রাষ্ট্র’, অসুখের কবিতারা, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ২৬

১৪।‘জগৎগৌরী কাব্য’-১৮, শ্রেষ্ঠ কবিতা, হিন্দোল ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২৩, পৃ. ৫৩

১৫। ‘কবরনামা’, শ্রেষ্ঠ কবিতা, হিন্দোল ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২৩, পৃ. ৬৯

১৬। ওই, পৃ. ৭১

১৭। ‘টাকা’, শ্রেষ্ঠ কবিতা, হিন্দোল ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২৩, পৃ. ৯০

১৮। ‘পীড়াসমূহ’-৪, পীড়াসমূহ, যশোধরা রায়চৌধুরী, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৩৫

১৯। ‘বন্ধ্যতা সমাচার’, পীড়াসমূহ, যশোধরা রায়চৌধুরী, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২২, পৃ. ২২

২০। ওই

২১। ‘দ্য প্লেগ’, উপন্যাস ত্রয়ী, আলব্যের ক্যামু, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (অনুবাদক), নালন্দা, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট), ঢাকা ১১০০, ফেব্রুআরি ২০২১, পৃ. ৩৮৩

২২।‘দোকান’, একরোখা চিরুনি তল্লাশি, সুদেষ্ণা মৈত্র, ধানসিঁড়ি, ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ২৩

২৩।‘ভ্রমচরিত’, একরোখা চিরুনি তল্লাশি, সুদেষ্ণা মৈত্র, ধানসিঁড়ি, ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ৩৯

২৪। ‘ঘোরপর্ব-১’, দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম, সুতপা চক্রবর্তী, আদম, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, অগস্ট ২০২৫, পৃ. ২৭

© Santiniketan Sahityapath

২৫। ‘বৃষ্টিদরজার পোকা’, দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম, সুতপা চক্রবর্তী, আদম, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, অগস্ট ২০২৫, পৃ. ৪৩

২৬। ‘এইসব সেরে গেলে’, অসুখের কবিতারা, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ৩২

২৭। ‘ওভারডোজ’, শ্রেষ্ঠ কবিতা, হিন্দোল ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০২৩, পৃ. ১৫৯

২৮। ‘এইসব সেরে গেলে’, পীড়াসমূহ, যশোধরা রায়চৌধুরী, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান, নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৬২

২৯। ‘অনাহূত’, একরোখা চিরুনি তল্লাশি, সুদেষ্ণা মৈত্র, ধানসিঁড়ি, ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ১৫

৩০। ‘গৃহস্থ’, একরোখা চিরুনি তল্লাশি, সুদেষ্ণা মৈত্র, ধানসিঁড়ি, ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ৬৪

৩১। ‘হে কীর্তন জীবন’, দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম, সুতপা চক্রবর্তী, আদম, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, অগস্ট ২০২৫, পৃ. ৬৫

গ্রন্থপঞ্জি:

১। আলব্যের ক্যামু, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (অনুবাদক), ‘উপন্যাস ত্রয়ী’, নালন্দা, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট), ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০০৬

২। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, ‘অসুখের কবিতারা’, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান ৭১৩১০১, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২১

৩। যশোধরা রায়চৌধুরী, ‘পীড়াসমূহ’, বার্ণিক প্রকাশন, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান ৭১৩১০১, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২২

৪। রণজিৎ দাশ, ‘রণজিৎ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, জানুআরি ২০০২

৫। রাজশেখর বসু, ‘পরশুরাম গল্পসমগ্র’, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯

৬। রাহুল পুরকায়স্থ, ‘নির্বাচিত কবিতা’, কবিতা আশ্রম, চাঁপাবেড়িয়া বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০২২

৭। শঙ্খ ঘোষ, ‘শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭০

৮। সুতপা চক্রবর্তী, ‘দেরাজে হলুদ ফুল, গতজন্ম’, আদম, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২

৯। সুদেষ্ণা মৈত্র, ‘একরোখা চিরুনি তল্লাশি’, ধানসিঁড়ি, ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১

১০। হিন্দোল ভট্টাচার্য, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০২৩

—

© Santiniketan Sahityapath